প্রথম আলো

তারিখ 27 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা কি অধিকার না বাণিজ্য?

শি ক্ষা

হায়দার আকবর খান রনো

ইতিপূর্বে পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণের যে অভিযোগ এনে আমি *প্রথম আলোর* পাতায় লেখা দিয়েছিলাম, তা ছিল একাধারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী। অথচ এমন কাজটি করেছে এমন এক সরকার, যারা নিজেদের স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি বলে দাবি করে।

পাঠ্যপুস্তকে যেসব অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আনা হয়েছিল, তার কারণ এখনো সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়নি। যেসব মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তি প্রায় সব বিষয়ে অহরহ বক্তব্য দিয়ে থাকেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। আর যাঁর দায়িত্ব ছিল সর্বাগ্রে ব্যাখ্যা দেওয়ার, সেই শিক্ষামন্ত্রীও জনগণের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। আমাদের বক্তব্য হলো হেফাজতের সুপারিশক্রমে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে সরকার, তা হচ্ছে বড় ধরনের অন্যায়।

এবার আসা যাক শিক্ষা প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ে। আমাদের সংবিধানের ১৭(ক) ধারায় বলা আছে, 'রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য...কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর মাত্র কয়েক বছর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। তারপর থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়।

১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য যে ১০ দফা দাবি পেশ করেছিল, তার অন্যতম দাবি ছিল, 'শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন, গ্রাম-শহরসহ সকল বৈষম্য (ক্যাডেট কলেজ, কিন্ডারগার্টেন, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, প্রি-ক্যাডেট, টিউটোরিয়াল হোম ইত্যাদি) দূর করে সারা দেশে অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।' বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লেখা 'ওয়ান চ্যানেল অব এডুকেশন' কথাগুলো সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ব্যবহার করেছিল। সম্ভবত তাদের ধারণা ও দাবিকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য। সেদিন ছাত্রদের এই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা। ১৫ দল, ৭ দল ও ৫ দল সবাই সমর্থন দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিএনপি তিনবার এবং আওয়ামী লীগ তিনবার ক্ষমতায় এসেছে (এবং এখনো ক্ষমতায় আছে)। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। একমুখী শিক্ষানীতি তো নেই-ই বরং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৯০-পরবর্তী সময়েই শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, প্রাইভেটাইজেশন এবং শিক্ষার ব্যয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষকদেরও দীর্ঘদিনের দাবি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পার্থক্য ঘুচিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হোক। সমগ্র দেশে একই মানের একই ধরনের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষা চালু করা হোক। শিক্ষক সমাজের এই দাবি সংবিধানে বর্ণিত সমাজতন্ত্রের সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র কথাটি বাদ দিয়েছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের এমন অপব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন, যা পুঁজিপতি শ্রেণির নিকটও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে বহুল আলোচিত পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়, তাতে ১৯৭২-এর সংবিধানের সেই বিশেষ ধারা ফিরে আসে এবং সমাজতন্ত্র আবার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা কেবল কথায়। বাস্তবে কি অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে যা চলছে, তা সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি। শিক্ষাক্ষেত্রেও শ্রেণিবৈষম্য ও বাণিজ্যিকীকরণ এখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে।

২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি সংসদে পাস করা হয়। তখন থেকে তা আইনে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। গত বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের ৩ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শিক্ষা আইন খসড়া আকারে উপস্থাপন করা হয় এবং শিক্ষাবিদ ও অন্যদের মতামতের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয় মাত্র সাত দিন। নীতি ও নীতির আলোকে প্রণীত আইনের খসড়ার কোথাও একমুখী ও বৈষম্যহীন শিক্ষার কোনো বিধান রাখা হয়নি। বরং আরও বেশি করে শ্রেণিবিভাজন ও বাজারি বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়

খুব মোটা দাগে ধরলে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। এর মধ্যে উপবিভাগও আছে।

১. সাধারণ শিক্ষা : সাধারণ স্কুলে (সরকারি বা এমপিওভুক্ত বেসরকারি) বা কলেজে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন) যা পড়ানো হয়, এখানে পড়ে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা।

২. ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা : যার অনেকগুলোই আমাদের জাতীয় শিক্ষা কোর্সের অন্তর্ভুক্ত নয়। ও লেভেল, এ লেভেল ইত্যাদি। এখানে পড়ে ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা। তা ছাড়া একই শিক্ষা কোর্সের ইংলিশ ভার্সন নামে আরেক ধরনের স্কুল আছে, যার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সরকার কখনো বোঝাতে সক্ষম হয়নি।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা : এখানে পড়ে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা। তার মধ্যে আবার কওমি মাদ্রাসায় পড়ে সবচেয়ে গরিব শিশুরা। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদেরই প্রতিষ্ঠান হেফাজতে ইসলাম। ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ে, তারা সত্যিকারের শিক্ষা কতটুকু লাভ করে, তা বলা কঠিন। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারা সাধারণত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোতেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়। বিশেষ করে, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাক্রমে পঞ্চম শ্রেণির ওপরে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা শেখানো হলেও বাংলা ভাষা শেখানো হয় না। ইংলিশ মিডিয়াম আর মাদ্রাসা উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত শেখানো হয় না। এ লেভেল, ও লেভেল যেসব বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, সেখানেও জাতীয় সংগীত শেখানো হয় না।

স্কুল পর্যায়ে অভিন্ন শিক্ষা কোর্স থাকা উচিত। আজ থেকে অর্ধশতাব্দীরও আগে পাকিস্তান আমলেই শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যা বলেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'সাবেক প্রথায় বাংলাদেশে এখনও তিনটি শিক্ষাপ্রণালী আছে এবং তাহা সরকারের অনুমোদিত নিউ স্কীম মাদ্রাসা, ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা। ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু গন্ডগোলই সৃষ্টি করিয়াছে এবং মুসলিম সমাজে অনৈক্য আনয়ন করিয়াছে।...আযাদ পাকিস্তানে ইহাদের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন বরং হাস্যকর ও লজ্জাকরও বটে। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে সরকার একাধিক শিক্ষাপ্রণালী কখনও মঞ্জুর করে না।' ('সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার—আমাদের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৯৫৯ সাল)

বাংলাদেশে ১৩ রকমের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। একদিকে যেমন আছে দরিদ্র সন্তানদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্যদিকে তেমনি আছে রাজধানীর বারিধারায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, যার প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ফি ১০ লাখ ৩ হাজার টাকা। বার্ষিক টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি বাবদ লাগে ১৭ লাখ ২১ হাজার টাকা। বসুন্ধরায় অবস্থিত অনুরূপ আরেকটি স্কুলে প্রথম শ্রেণির ভর্তি ফি ৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা এবং বছরে বেতন ও অন্যান্য ফি বাবদ লাগে ৯ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। (এই পরিসংখ্যান কয়েক বছরের আগের, এখন সম্ভবত বেতন ফি বেড়েছে)।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্য পরিপূর্ণরূপে সংবিধান পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রের ধারণার পরিপন্থী এবং অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

শিক্ষা এখন বাণিজ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যাঁর যত টাকা তাঁর সন্তানেরা তত বেশি নামীদামি স্কুলে পড়বে। অবশ্য নামীদামি স্কুলে পড়লেই যে ভালো শিক্ষা লাভ করবে, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। ভালো সার্টিফিকেট পাওয়া যেতে পারে, যা চাকরির বাজারে কাজে লাগবে। কিন্তু সেটাই কি সত্যিকারের শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান থেকে সাত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার ধারা বর্ষিত হইতেছে...। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনো একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র।' তিনি আরও বলেন, এই শিক্ষা 'কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতির সাধনে ব্যস্ত।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে দিকটির সমালোচনা করেছিলেন, এখন সেই প্রবণতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদা ব্রিটিশ আমলে সেকেলে কেরানি বানানোর উপযোগী শিক্ষার প্রচলন ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির স্বার্থে। বর্তমানেও দেখা যায়, শিক্ষার বাজারীকরণের ফলে এই ধরনের কোর্সের কদর বেড়েছে। ভালো চাকরির আশায় ছাত্রছাত্রীরা এসব পড়ে ও ডিগ্রি পায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও এসব কোর্স আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌলিক বিজ্ঞান, যথা পদার্থবিদ্যা, গণিত অথবা বাংলা ভাষা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অনুপস্থিত থাকে। এককালে ব্রিটিশরা চেয়েছিল কেরানি। এখন আন্তর্জাতিক করপোরেট পুঁজিও চায় উঁচু দরের কেরানি। সে জন্য শিক্ষা কোর্স এভাবেই তৈরি হচ্ছে। শিক্ষা তার আদর্শ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

একটি জাতি যদি এভাবে প্রকৃত শিক্ষা থেকে দীর্ঘ সময় দূরে সরে থাকে, তবে সে জাতির ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকার। শিক্ষাবিদ, দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও দেশ নিয়ে ভাবেন এমন সৎ মানুষের এখনই সোচ্চার হওয়া দরকার। আমরা প্রকৃত শিক্ষা চাই, যা জ্ঞানের আলো ছড়াবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাজারীকরণের নীতি এখনই পরিত্যাগ করতে হবে। শিক্ষা হোক অধিকার। শিক্ষা হোক বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রকৃত মানুষ গড়ার উপায়।

● **হায়দার আকবর খান রনো: রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।**